



## **Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**

**A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 123 - 133

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: [editor@tirj.org.in](mailto:editor@tirj.org.in)

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

# পদাবলী সাহিত্যে শিশু মনস্তত্ত্বের পরিচয়

আবুল হোসেন আনসারী

গবেষক, বাংলা বিভাগ

সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: [abulhossan786@gmail.com](mailto:abulhossan786@gmail.com)



**Received Date 20. 01. 2026**

**Selection Date 10. 02. 2026**

### **Keyword**

Child psychology,  
Childhood,  
Yearly,  
Behaviour,  
Emotion feeling,  
Curious,  
Language  
development,  
Mental &  
intellectual  
development.

### **Abstract**

One of the distinguished branches of medieval literary tradition is Padabali literature. In this branch of literature, along with the depiction of the love-play of Radha and Krishna, the poets have also beautifully portrayed the aspect of child Krishna's parental affection (vatsalya). Particularly, when the poems of the vatsalya phase are analyzed, the simple, innocent, and spontaneous aspects of child psychology become evident. A comprehensive picture emerges here of how children's behaviour, their mental and intellectual development, diverse emotions and feelings, and the growth of language take place. A child, within six to nine months after birth, becomes capable of gaining control over his body, learns to sit, and tries to grasp whatever comes within reach and put it into the mouth. Moreover, an important characteristic of children's behaviour in early childhood is "grouping." The child's mind always expresses a desire to play collectively with peers of the same age. Children generally do not wish to remain calm or still; they are essentially worshippers of restlessness. Curiosity and liveliness constantly prevail in their minds. Even when a mother remains absent for a long time and hunger reaches an extreme level, anger arises in the child's mind. As a result, children vent their anger on whatever they find in front of them—such aspects have been reflected in the poems of Balaram Das, Uddhav Das, and Jadabendra Das.

Curiosity in a child's mind arises most prominently in two situations: first, on the playground, and second, during mealtime. Such behaviour is also observed in child Krishna (Balgopal). When Yashoda tries to feed Krishna milk or butter, eating becomes only a pretext; joy becomes the primary thing in the child's mind. And from this joy arises curiosity. Therefore, along with eating, through dance and clapping, he wins over his mother's heart—this picture has been beautifully portrayed by Balaram Das in one of his poems. When excessive joy arises in a child's mind, emotions are generated. In childhood, the child's mind always seeks freedom from being confined within the house. Riding on the wings of desire, they easily become absorbed in the accumulation of joy. The Shakta poets have worshipped Uma mainly in two forms: on one hand as Uma, the daughter of Menaka and Giriraj, and on the other hand as Shyama. The poems of the childhood-play phase have been composed

centering around this Uma. While portraying the childhood games and activities of Uma, Shakta poets like Ramprasad Sen, Radhika prasanna, Kalimirza and others have tried to present the atmosphere of child psychology clearly before the readers, which can be considered an innovative addition to Shakta Padabali literature. It can be said that in the poems of the childhood-play phase of Shakta Padabali as well, various poets have created an intimate understanding of child psychology centering on Uma's growth in childhood. Here, the various mischievous acts and restlessness of little Uma have repeatedly attracted the minds of readers. Uma has not remained merely the daughter of Giriraj and Menaka; within her behaviour, readers have discovered the reflection of their own children.

## Discussion

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি জনপ্রিয় সাহিত্যের ধারা হল পদাবলী সাহিত্যের ধারা। এই সাহিত্যশাখা মূলত দুই ভাগে বিভক্ত— ১. বৈষ্ণব পদাবলী ও ২. শাক্ত পদাবলী। বৈষ্ণব পদাবলীর মূল উদ্দেশ্য হল— রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মাহাত্ম্য বর্ণনা। কিন্তু বেশ কয়েকজন পদকর্তা তাঁদের বাৎসল্য পর্যায়ের পদে কৃষ্ণের দৈব মহিমার আড়ালে তাঁর মানব-মূর্তিটিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। ফলস্বরূপ, শিশুকৃষ্ণ হয়ে উঠেছে আমাদের চারপাশে বেড়ে ওঠা আর পাঁচটা শিশুর মতো। বলা যেতে পারে, কৃষ্ণ তাঁর পৌরাণিক আভরণ ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছে একেবারে ঘরোয়া আঙিনায়। শিশু কৃষ্ণের এই শৈশবকালীন খেলাঘরটিকে কেন্দ্র করে উদ্ধব দাস, বলরাম দাস, যাদবেন্দ্র দাস প্রমুখ পদকারগণ বাৎসল্য পর্যায়ের পদ রচনা করেছেন। সেখানে কৃষ্ণের জন্ম থেকে শুরু করে শৈশবের নানারৈখিক বৈচিত্র্য সমেত শিশু-মনস্তত্ত্বের বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ছায়াপাত লক্ষ করা যায়, যা বৈষ্ণব পদাবলীকে একটি স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছে। এ প্রসঙ্গে মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে শিশু’ প্রবন্ধে বলেছেন—

“বৈষ্ণব-পদাবলীর সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদে শিশু চরিত্র ও শিশু-মনস্তত্ত্ব যেভাবে চিত্রিত হয়েছে পাঠকের কাছে তার আবেদন অনস্বীকার্য।”<sup>১</sup>

একটি শিশুর জন্মগ্রহণের পর বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে পিতামাতার নানান বৈশিষ্ট্য উঠে আসতে দেখা যায়। তাছাড়া শিশু যে পরিবেশে বড়ো হয়ে উঠে মূলত সেখান থেকেই সে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এ প্রসঙ্গে রমেশ, দাস তাঁর ‘শিশু-মন’ গ্রন্থে বলেছেন—

“আপন পরিবার ও পরিজনের সঙ্গে শিশুর রূপ-গুণগত যে সাদৃশ্য ভিন্ন পরিবার ও ভিন্ন জনের সঙ্গে তার সেরকম সাদৃশ্য দেখা যায় না।”<sup>২</sup>

বৈষ্ণব পদাবলীর বাৎসল্য পর্যায়ের পদগুলিতে দেখা যায়, কৃষ্ণের মধ্যে নন্দ ও যশোদার রূপের সাদৃশ্য নেই, কিন্তু কৃষ্ণ যেহেতু নন্দগৃহে প্রতিপালিত হয়েছে তাই গোপ পরিবারের যাবতীয় আদবকায়দা শৈশব থেকেই তার মধ্যে উঠে এসেছে। এরই মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে শিশু মনস্তত্ত্বের রূপরেখাটি। অর্থাৎ বৈষ্ণব পদাবলীর বাৎসল্য পর্যায়ের পদে কীভাবে শিশু মনস্তত্ত্বের দিকটি উদ্ভাসিত হয়েছে, আলোচ্য অধ্যায়ে সে দিকটি আলোকপাত করা হবে।

১) আচরণগত— একটি শিশু জন্মের ছয় থেকে নয় মাসের মধ্যে শরীরকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়ে উঠে, বসতে শেখে এবং হাতের নাগালের মধ্যে যা পায় তাই সে মুষ্টিবদ্ধ করে মুখের ভিতর নিয়ে আসতে চায়। উদ্ধব দাস তাঁর বাৎসল্য বিষয়ক পদের ‘বিশ্বরূপ দর্শন’ অংশে কৃষ্ণের আচরণে সেদিকটিই প্রত্যক্ষ করেছেন। নন্দগৃহের আঙিনায় বসে খেলা করতে করতে মাখন, সর ভুলে ছোট্ট কৃষ্ণ মনের সুখে মাটি খায়। কৃষ্ণের এরূপ আচরণ গ্রাম বাংলায় বড় হয়ে ওঠা প্রত্যেকটি শিশুর মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু বিষয়টি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক হলেও ছোট্ট শিশুর এহেন আচরণের ক্ষেত্রে কোনো ভুল খুঁজে পাওয়া যায় না।

শৈশবকালে শিশুদের আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ‘দলবদ্ধতা’। শিশুমন সর্বদায় তার সমবয়সীদের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে খেলা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। পদকর্তা উদ্ধব দাস শিশুমনের এই বিশেষ প্রবণতাটি ছোট্ট কৃষ্ণের আচরণে প্রত্যক্ষ করেছেন। সেখানে বালগোপাল কৃষ্ণকে একা দেখা যায় না; সমবয়সী সখাদের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে আঙিনায় হামাগুড়ি দিয়ে খেলা করতে সে ব্যস্ত। কবির ভাষায়—

“বাল গোপাল সঙ্গে সমবয় সখা সঙ্গে  
 হামাগুড়ি আঙিনায় খেলায়।  
 তেজিয়া মাখন সরে তুলিয়া কমলকরে  
 মৃত্তিকা মনের সুখে খায়।।”<sup>৩</sup>

শৈশববেলায় শিশুদের শরীর সহজে ক্লান্ত হয় না, তাই তারা বেশিক্ষণ ঘুমের মধ্যে থাকতে পারে না। নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা নিবৃত্তির আবদার করে বসে, তাই বলে যে তারা ভীষণ ক্ষুধার মধ্যে রয়েছে তা নয়, খাবারের অজুহাতে মাকে কাছে ডাকা শিশুদের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। শিশু কৃষ্ণের আচরণে ঠিক একই ছবি প্রত্যক্ষ করা যায় বলরাম দাসের একটি পদে—

“নিদ্রাগত ছিল কৃষ্ণ শয়ন মন্দিরে  
 নিদ্রাভঙ্গ হইল বৈসে পালঙ্ক উপরে।  
 আমার হয়েছে ক্ষুধা শুন গো জননী  
 স্তন কিংবা দেহ মোরে খাইতে নবনী।।”<sup>৪</sup>

এমনকি দীর্ঘক্ষণ মায়ের অনুপস্থিতি ও ক্ষুধার জ্বালা দুই যখন চরমে পৌঁছায় তখন শিশুমনে ক্রোধের উন্মেষ ঘটে। ফলস্বরূপ, শিশুরা সামনে যা কিছু পায় তার উপর সেই ক্রোধের জ্বালা বর্ষণ করে। বলা যেতে পারে, কৃষ্ণের আচরণে এই সমস্ত দিকগুলি শিশুমনের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখেই পদকর্তা তার পদে বর্ণনা করেছেন।

২) **কৌতূহল প্রবণতা**— শিশু মনস্তত্ত্বের আলোচনায় দেখা যায়, শৈশববেলায় শিশুরা সাধারণত শান্ত বা স্থির অবস্থায় থাকতে চায়না, তারা মূলত অস্থির মনস্কের পূজারী। তাদের চিন্তে সর্বদায় চঞ্চলতা বা কৌতূহলীপনা বিরাজ করে। শিশুমনে কৌতূহল সবচেয়ে বেশি আসে দুটি পরিস্থিতিতে প্রথমত, খেলার মাঠে এবং দ্বিতীয়ত খাদ্যগ্রহণের সময়। বালগোপাল কৃষ্ণের মধ্যেও এই ধরনের আচরণ পরিলক্ষিত হয়েছে। যশোদা কৃষ্ণকে ক্ষীর, ননী খাওয়াতে গেলে খাওয়াটা সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র, শিশুমনে আনন্দটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। আর এই আনন্দ থেকেই তার মনে কৌতূহলী ভাবের উদয় হয়েছে, তাই খাবারের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ও করতালির মধ্য দিয়ে সে মায়ের মন জয় করেছে। বলরাম দাস বলেছেন—

“খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিনী বাজে  
 হেরি হরষিত ভেল মায়।।  
 নন্দদুলাল নাচে ভালি।  
 ছাড়িল মস্তনদন্ত উথলিল মহানন্দ  
 সঘনে দেয় করতালি।।”<sup>৫</sup>

শৈশববেলায় শিশুরা ঘনঘন খেতে চায়, এই বারবার খেতে চাওয়ার প্রবণতা গোপালের আচরণেও লক্ষ করা যায়। বালগোপাল কৃষ্ণের এই অভ্যাস কবি যশোদার মুখ দিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন—

“দন্ডে দশবার খায় তার নাহি লেখা  
 নবনী লোহিত গোপাল পাছে আইসে একা।।”<sup>৬</sup>



এক বছর বয়সেই প্রকৃত শব্দটি শিশুর মুখে উচ্চারিত হয়। প্রকৃত শব্দ বলতে আমরা সেই শব্দটিকে বোঝাতে চাইছি যা শিশু কোনো একজন ব্যক্তি বা বস্তুকে চিহ্নিত বা নির্দেশিত করতে ব্যবহার করে।”<sup>১০</sup>

এই মন্তব্যের নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে, বৈষ্ণব পদাবলীর বাৎসল্য রসের পদে কৃষ্ণের ভাষাগত বিকাশের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

বলরাম দাস কৃষ্ণের শৈশবলীলার দিকটি তুলে ধরতে গিয়ে কৃষ্ণের মধ্য দিয়ে শিশুমনের ভাষাগত বিকাশের দিকটি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কৃষ্ণ ঘুম থেকে উঠেই ক্ষুধা নিবারণের জন্য মা মা বলে ডাকতে শুরু করে। সাধারণত এই বুলি শুদ্ধভাষা বলেই আমাদের মনে হয়। কবির ভাষায়—

“মা মা বলিয়া তবে বাহিরে আইলা।  
কি খাব বলিয়া কৃষ্ণ কাঁদিতে লাগিলা।।  
দেহ দেহ ননী দেহ বলে বারম্বার।  
ক্ষুধায় ব্যাকুল প্রাণ হইল আমার।।”<sup>১১</sup>

শিশুরা প্রায় ১৮ মাসের মধ্যে আধো আধো কথা বলতে শিখে যায়। এমনকি দু’শব্দ যোগে বাক্য গঠন করে নিতেও সক্ষম হয়ে ওঠে। আলোচ্য পদটিতে শিশু কৃষ্ণের ভাষার বিকাশ ঘটেছে এবং সেও অতি অল্পবয়সে দু’শব্দ যোগে বাক্যগঠন করে কথা বলতে পারদর্শী হয়ে উঠেছে। বলা যেতে পারে, বলরাম দাস শিশুমনের ভাষা বিকাশের চিরাচরিত দিকটি আমাদের নিকট স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ, শিশুদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিকাশের দিকটাও প্রবহমান থাকে।

**৫) বিচিত্র আবেগানুভূতি**— বৈষ্ণব-পদাবলীর বাৎসল্য রসের পদে পদকর্তাগণ মূলত কৃষ্ণের মানবিক মহিমার স্বরূপটিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। বলা যেতে পারে, কৃষ্ণের মানবিক আবেদনের দিকগুলি তুলে ধরতে গিয়েই পদকর্তারা শিশুমনের বিচিত্র আবেগানুভূতির কথা বলেছেন। উদ্ধব দাস, বলরাম দাস, যাদবেন্দ্র প্রমুখের বাৎসল্য-রসের পদে কৃষ্ণের শৈশব বয়সের নানান অনুভূতির কথা উঠে এসেছে।

শিশু মনস্তত্ত্বের আলোচনায় আবেগের চারটি মূল স্তম্ভ হল— ‘আনন্দ’, ‘রাগ’, ‘দুঃখ’, ‘ভয়’। শৈশবে এই সমস্ত অনুভূতিগুলির উপরে শিশুর আবেগিক বিকাশ নির্ভর করে। বৈষ্ণব পদাবলীতে যশোদা-তনয় কৃষ্ণের শৈশবেও এই আবেগিক অনুভূতির বিচরণ প্রত্যক্ষ করা যায়।

প্রথমত, শিশুমনে অতিরিক্ত আনন্দের সঞ্চারণ হলে আবেগের সৃষ্টি হয়। শৈশববেলায় শিশুমন সর্বদায় ঘরবন্দী দশা থেকে মুক্তি পেতে চায়। ইচ্ছেডানায় ভর করে তারা অনায়াসে আনন্দের সঞ্চয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যাদবেন্দ্রের একটি পদে দেখা যায়, নন্দ দুঃখদহনের জন্য বাথানে যাবেন, সঙ্গে নিয়ে যাবেন কৃষ্ণ ও বলরামকে। কবির ভাষায়—‘নন্দ কহে চল যাইব বাথানে’, এই ডাক শ্রবণ করা মাত্র তারা পুলকিত হয়ে উঠেছে। বলরাম দোহনভাণ্ড এবং কৃষ্ণ পায়ের বাধা অর্থাৎ ছাদন দড়ি নিয়ে নন্দের সঙ্গে বাথানের উদ্দেশ্যে গমন করেছে। চোখে মুখে তাদের আনন্দের হাতছানি। যাদবেন্দ্র তাই বলেছেন—

“ধাইয়া যাইয়া বাধা পরায় চরণে  
আনন্দেতে রামকৃষ্ণ আইলা বাথানে।”<sup>১২</sup>

যাদবেন্দ্রের আরেকটি পদে দেখা যায়, বলরাম ও কৃষ্ণ গোচারণে গিয়েছেন, সেখানে কৃষ্ণের বাঁশির সুরে সমস্ত ধেনু ছুটে এলে, তা প্রত্যক্ষ করে দুজনেই আনন্দে আত্মহারা হয়েছে। আসলে এখানে শিশুমনের কৌতূহলপূর্ণ উদ্দীপনার ভাবাবেশ ঘটেছে। শিশু কৃষ্ণের নিকট পুচ্ছ উচ্চ করে ধবলীরা যেভাবে দাঁড়িয়েছে, সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে শিশুমনও আবেগে ভরে উঠেছে। বলা যেতে পারে, এই সমস্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আনন্দের মধ্যে দিয়ে। কবির ভাষায়—

“ধবলী আসিয়া কানুরে দেখিয়া

চঞ্চল নয়নে চায়।

দেখিয়া ধবলী সুখ হইল বড়ি  
আনন্দে অবধি নাই।”<sup>১০</sup>

রাগ বা রোষ হল শিশুদের আবেগিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তাদের স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করলে তারা সহজেই রাগ করে বসে। শিশুমনের এই বৈশিষ্ট্য বৈষ্ণব পদাবলীর শিশু কৃষ্ণের মধ্যেও উঠে এসেছে। শৈশবেলায় শিশুদের মূল আশ্রয়স্থল হল— মায়ের কোল। বলরাম দাসের একটি পদে দেখা যায়, যশোদা গোপালকে কোলে না তুলে রোহিনীর সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মায়ের এই অনাদর গোপাল সহ্য করতে না পারায় ক্রোধান্বিত হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এই ঘটনা মা যশোদার মনে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে। বলরাম দাস সে চিত্রটিই তুলে ধরেছেন—

“গোপাল না লৈনু কোলে ভুলিনু রোহিনী বোলে  
সে কোপে কোপিত যাদুমণি।  
কোপিত নয়ান কোনে চাইয়াছিল আমা পানে  
আমি কি এমন হবে জানি।”<sup>১১</sup>

আবার এই রাগের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে শিশুর অভিমান। শিশুমনে রাগের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে অভিমানও মুখরিত হয়ে উঠে। যেমন— ননী চুরি করে খাওয়ার অপরাধে যশোদা কৃষ্ণকে ননীচোরা বলে অপবাদ দিয়েছেন। তাই কৃষ্ণ অভিমানী মন নিয়ে নন্দের নিকট অভিযোগ জানিয়েছে। কবির ভাষায়—

“দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে  
বুক বাহিয়া পড়ে ধারা।  
না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে  
মা হইয়া বলে ননীচোরা।”<sup>১২</sup>

তাছাড়া, শিশুমনের অনুভবের আরও একটি দিককে লেখক স্পষ্ট করতে চেয়েছেন পাঠকের কাছে। যেমন শিশুরা নিজের দোষ অন্যের উপর চাপাতে দুবার ভাবেনা, এক্ষেত্রেও দেখা যায় চুরি করে ধরা পড়লে কৃষ্ণ তার সহোদর বলরামের উপর দোষ চাপাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি, বরং উল্টে যশোদাকে তার কাজের জন্য দোষারোপ করেছে।

তাছাড়া শিশুদের ক্ষুধা পেলে তারা সহজেই রাগ করে বসে। রমেশ দাস তার ‘শিশু-মন’ গ্রন্থে বলেছেন—

“ক্ষুধার্ত এবং অবসন্ন হলেও শিশুরা অনেক সময় রাগ করে এক্ষেত্রে অভিভাবকেরা যদি শিশুর এই রাগকে উপেক্ষা করে তাহলে তাদের রাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।”<sup>১৩</sup>

সাধারণত নিদ্রাভঙ্গের পরে শিশুরা খাবার খেতে ইচ্ছে প্রকাশ করে, খাবার পেতে বিলম্ব হলে শিশুমনে রাগ ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে। এখানে কৃষ্ণও প্রভাতবেলায় নিদ্রাভঙ্গের পরে যশোদার নিকট খাবার চেয়েছে, এবং তা পেতে ক্ষণকাল মাত্র বিলম্ব হলে রেগে ভাঙ ফেলে দেওয়ার কথা বলেছে। বলরাম দাস শিশুমনের সে দিকটিকেও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন—

“দেহ দেহ ননী দেহ বলে বারম্বার।  
ক্ষুধায় ব্যাকুল প্রাণ হইল আমার।।  
এত বলি দ্রুত ধরে মথনের দণ্ড।  
ভঙ্গিয়ে ফেলিব এই যত আছে ভাণ্ড।”<sup>১৪</sup>

৬) অনুকরণপ্রিয়তা— বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীল, স্বাবলম্বী হওয়ার ইচ্ছা মাথা চাড়া দেয়। তখন শিশু তার নিজের সমবয়সী বন্ধুদের মধ্যে কিছুটা নেতৃত্ব স্থানীয় হয়ে উঠতে চায়। পদাবলীর কৃষ্ণও তার বন্ধুদের

মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছে এবং বাকি সকল বন্ধুগণ তাকে রাজা হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে। উদ্ধব দাস সেই রাজকীয় দৃশ্য পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন—

“বিবিধ কুসুম দিয়া  
সিংহাসন নিরমিয়া  
কানাই বসিলা রাজাসনে  
রচিয়া ফুলের দাম  
ছত্র ধরে বলরাম  
সদসদ নেহারে বদনে।”<sup>১৮</sup>

এছাড়া, এই ঘটনার মধ্যে শিশুমনের অনুকরণপ্রিয়তার দিকটিও প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষত শিশুরা বড়োদের নিকট যা প্রত্যক্ষ করে তা মনের মধ্যে রেখে দেয় এবং সুযোগ পেলে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। তৎকালীন সমাজ ছিল রাজার শাসনভারে আবদ্ধ। অর্থাৎ, এই রাজার কাহিনি সম্পর্কে শিশুরাও অবগত ছিল। তাই তাদের খেলার মধ্যেও অনুকরণপ্রিয়তার দিকটি লক্ষ করা যায়। অনেক সময় শিশুরা বাবা-মা এবং পরিজনদের কাজের অনুকরণ করতে চায়। এই অনুকরণের বিষয়টি শিশু কৃষ্ণের মধ্যেও দেখা গেছে।

মথুরা থেকে একজন ফল বিক্রেতা গোকুলে ফল বিক্রি করতে এলে সকলে মূল্য দিয়ে বিনিময়ে তার কাছ থেকে ফল কিনে খায়, এই ঘটনা শিশু কৃষ্ণের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি করে। কারণ যা কিছু অজানা বিষয় ছোট্ট শিশুর নিকট তা পরম কৌতূহলের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়। কবির ভাষায়—

“শুনি কৃষ্ণ কুতূহলী ধন্য লইয়া একাঞ্জলি  
কর হইতে পড়িতে পড়িতে  
পশারি নিকটে আসি ফলদেও বলে হাসি  
ধান্য দিল ফলাহারী হাতে।”<sup>১৯</sup>

শিশুর ভালোবাসার প্রথম মানুষটি হল তার মা, কারণ পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার পর একমাত্র মা তার সমস্ত চাহিদা মেটায়। আদর ও ভালোবাসা দিয়ে তাকে ভরিয়ে তোলে। শিশু মা'য়ের কাছে তার যাবতীয় ইচ্ছা বা আবদার মূলক মনের কথাগুলি প্রকাশ করে এবং মা তাকে সম্মতিও দেবে সেরকম একটা বিশ্বাস তৈরি হয়ে যায়।

পদাবলী সাহিত্যের বাল্যলীলার পদে শিশু কৃষ্ণ ও যশোদার মধ্যেও এই বিষয়টি লক্ষ করা যায়। যেখানে অন্যান্য বালকদের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে ছোট হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ মায়ের কাছে বায়না ধরেছে, তাকে যেন বন্ধুদের সঙ্গে গোষ্ঠে যেতে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সে জানে গোষ্ঠে যেতে হলে মায়ের সম্মতি একান্ত জরুরী। অন্যদিকে, সমবয়সী বন্ধুদের প্রতি শিশুর এই যে আকর্ষণ তা কৃষ্ণের মধ্যেও প্রতিফলিত, বলরাম দাস তার একটি পদে কৃষ্ণের মুখ দিয়ে তাই বলিয়েছেন—

“গোষ্ঠে আমি যাব মাগো গোষ্ঠে আমি যাব  
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব।”<sup>২০</sup>

বাল্যকালে শিশুর কোনো কাজের উপরেই মা আস্থা রাখতে পারেন না। তাকে সব সময় চোখে চোখে রাখতে চাই, কারণ চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে শিশুমন তখন সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে।

এই কারণে যশোদার মনও কৃষ্ণের গোষ্ঠে যাওয়ায় উদ্ভিন্ন হয়েছে, কারণ কৃষ্ণ নেহাতেই ছে তার উপর আবার জেদি ও দুরন্ত। তাই যশোদা অন্যান্য বালকদের বারংবার সতর্ক করেছে যাতে কৃষ্ণকে তারা নিজেদের পরিবেষ্টনের মধ্যে রাখে।

“সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে  
ধীরে ধীরে করহ গমন।”<sup>২১</sup>

শাক্ত পদকর্তাগণ উমাকে মূলত দুটি রূপে আরাধনা করেছেন; একদিকে সে মেনকা ও গিরিরাজ কন্যা উমা এবং অন্যদিকে সে শ্যামা। এই উমাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে বাল্যলীলা পর্যায়ে পদগুলি। যেখানে উমার শৈশবকালীন লীলাখেলাকে তুলে ধরতে গিয়ে রামপ্রসাদ সেন, রাধিকাপ্রসন্ন, কালীমির্জা প্রমুখ শাক্ত পদকারগণ শিশু মনস্তত্ত্বের বাতাবরণটিকে পাঠকের সামনে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন, যা শাক্ত পদাবলীতে এক অভিনব মাত্রার সংযোজন ঘটিয়েছে বলে মনে করা যায়।

উমাকে শিশু-কন্যা রূপে কল্পনা করে তার শৈশবের নানান আচরণকে পদের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন যে সমস্ত পদকার তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রামপ্রসাদ সেন। তাঁর একটি পদে রয়েছে—

“গিরিবর, আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে।

উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান,

নাহি খাই ক্ষীর ননী সরে।।”<sup>২২</sup>

ভক্তকবি এই পদে মেনকার জবানীতে ছোট্ট উমার বায়নার কথাগুলিকেই তুলে ধরেছেন যা শিশুদের আচরণের একটি অন্যতম দিক। শৈশববেলায় তাদের বাস্তবজ্ঞান সেভাবে পরিপূর্ণতা পায়না বলেই তারা অনেক সময় অকারণে আবদার করে বসে। বেশিরভাগ সময়ে বায়না বা আবদার করার মানুষটি হয়ে থাকে তার মা। উমা মা মেনকার প্রতি অভিমান করে স্তন্যপান করেনি, উল্টে কান্নাকাটি করেছে। আবদার হল আকাশের চাঁদকে সে ধরতে চায়, কিন্তু তা যে উদ্ভট-কল্পনা মাত্র; সেই স্বাভাবিক বিষয়টিকে শিশু-মন কিছুতেই মেনে নিতে চায়না। কারণ প্রত্যেকটি শিশুর একটি নিজস্ব জগত থাকে। যেখানে তারা মনোমত বিচরণ করে বেড়ায়। কোনো বাস্তবতার ঠাঁই হয়না সেখানে।

শিশু মনস্তত্ত্বের বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শিশুদের মধ্যে সাধারণত রাগ তৈরীর অবকাশ ঘটেনা বা ঘটলেও সেটা ক্ষণস্থায়ী। যা মুখ্য হয়ে উঠে তা হল অভিমান। অবান্তর কোন কিছু চেয়ে যখন সেটা তারা পায়না তখন শিশুমন অভিমানে বৃন্দ হয়ে ওঠে, যার প্রকাশ ঘটে চোখের জলে। উমাও চৈতন্যভাগবতের গৌরাঙ্গের মতো আকাশের চাঁদকে এনে দেওয়ার আবদার করেছে। প্রসঙ্গত মুনমুন গঙ্গাপাধ্যায় তাঁর ‘প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে শিশু’ প্রবন্ধে বলেছেন—

“রামপ্রসাদ সেনের একটি পদে চাঁদের প্রতি উমার সৌন্দর্য-মুগ্ধ শিশুমনের ছবি এবং অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার তীব্র জেদ আর আবদারের পরিচয় অনবদ্যরূপে প্রকাশিত।”<sup>২৩</sup>

রামপ্রসাদ সেন বলেছেন—

“উমা কেঁদে করে অভিমান নাহি করে স্তন্যপান,

নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।।

আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,

ভূষণ ফেলিয়ে মরে মারে।।”<sup>২৪</sup>

ছোট্ট উমা একদিকে যেমন অভিমানী, অন্যদিকে অত্যন্ত সহজ-সরল বালিকা। সাময়িক কোনো কারণে কান্নাকাটি করলেও তা ভুলতে শিশুদের সময় লাগে না। শাক্ত পদাবলীতে পিতা গিরিরাজের স্নেহের পরশ পেয়ে উমা অভিমান ভুলে মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। আবার, গিরিরাজ উমাকে কোলে করে তার চাঁদবদনের সামনে আয়না এনে ধরেছেন। আকাশের চাঁদের সঙ্গে একমাত্র উমার চাঁদমুখেই তুলনীয়, আর সত্যিই উমা নিজের মুখমন্ডল দর্শন করে আকাশের চাঁদকে ধরতে না পারার দুঃখ ভুলে গেছে। বলা যেতে পারে, রামপ্রসাদ সেন শিশুমনের এই দিকটির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন—

“মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,

বিনিন্দিত কোটি শশধরে।।”<sup>২৫</sup>

শাক্ত পদাবলীর বাল্যলীলা পর্যায়ের একটি পদে দেখা যায়, মা মেনকা কন্যা উমার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন— 'রাজরাজেশ্বরী হয়ে হাস্য বদনে কথা কয়'। অর্থাৎ, উমার মুখে সর্বদাই হাসি লেগেই থাকে। শিশু মনস্তত্ত্বের আলোচনায় দেখা যায়, কারণে বা অকারণে হাসতে থাকাটা শিশুদের সহজাত প্রবৃত্তি। খুবই অল্প বয়সে যখন তাদের মানসিক গঠন পরিণত ভাবে গড়ে উঠে না, তখন সামান্য কারণে তারা খিলখিল করে হেসে ওঠে। এই হাসির মধ্যে না থাকে উদ্ধত আর না থাকে ব্যঙ্গ, তা নিতান্তই এক নিস্পাপ মনের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ, শিশুর এই হাস্যধ্বনি শুধুমাত্র পিতামাতাকেই নয়, পাশাপাশি অন্যান্য যেসব মানুষ শিশুর সংস্পর্শে থাকেন তাদের মনকেও এক গভীর প্রশান্তি দেয়। শাক্ত পদাবলীতে উমার হাস্যবদনও সকল বাঙালীর মন জয় করেছে।

শৈশবকাল থেকে শিশুরা চায় দল বেঁধে থাকতে, একা একা সময় কাটানোতে তাদের মনে স্কুর্তি আসে না। রাধিকাপ্রসন্নের একটি পদে দেখা যায়, উমার সখী জয়া; সে অভয়া অর্থাৎ উমাকে ডাকতে এসেছে। কিন্তু, মা মেনকা তাকে উমার ঘুম ভাঙতে নিষেধ করেছেন। অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে মা মেনকা জয়াকে জানিয়েছে, অতি কষ্টে সে তার শিশু কন্যাকে ঘুম পাড়িয়েছে। কবির ভাষায়—

“আর জাগাস নে মা জয়া অবোধ অভয়া  
কত করে ঘুমা এই ঘুমাল।”<sup>২৬</sup>

পদকর্তা এখানে শিশুমনের আচরণগুলি তুলে ধরেছেন। শিশু যখন তার শৈশব অবস্থায় বিরাজ করে তখন স্বাভাবিকভাবে তার মন থাকে চঞ্চল। যেকোনো সাধারণ বিষয় সম্পর্কেও বহুদূর সে কল্পনা করতে পারে। তখন তাদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থিরভাবে বসিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। প্রতিমুহূর্তে সে কিছু না কিছু করতে চায়। কখনো কল্পনাপ্রবন মন নিয়ে চারিপাশের সমস্ত জিনিসকে জানতে চায়, বুঝতে চায়। আসলে সে জানান দিতে চায় সমাজে তার অস্তিত্ব। যদিও শিশুর এই চঞ্চল স্বভাব মায়ের মনে আশঙ্কার সৃষ্টি করে। তাই কোনভাবে যদি মা তার সন্তানকে ঘুম পাড়াতে পারে তাহলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও নিশ্চিত হওয়া যায় এবং সন্তানটিও সুরক্ষিত থাকে। অর্থাৎ, মায়ের সন্তান সচেতনতার দিকটিও এখানে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

পিতা-মাতার স্নেহের বন্ধন ছেড়ে ধীরে ধীরে শিশুরা বাইরের জগত সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। স্বাধীনভাবে যেকোনো স্থানে তারা বিচরণ করে বেড়ায়, কখনো গড়ের মাঠে হারিয়ে যায়, আবার কখনো তারা কল্পনার আকাশে ফানুস উড়ায়। উমার মধ্যেও সারাদিন ঘুরে বেড়ানোর প্রবণতা দেখা যায়। কবির ভাষায়—

“উপরোধ উমা এড়াতে না পেরে  
সারাদিন বেড়ায় প্রতি ঘরে ঘরে।”<sup>২৭</sup>

শৈশবকালে ছোট বাচ্চাদের মধ্যে অহংবোধ বা আত্মসম্মানবোধ জন্মায় না, বরং তার মধ্যে জাগরিত হয় অদম্য কৌতূহল ও সবকিছুকে জানার বাসনা। তাই সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করা এমনকি অন্যের বাড়িতে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। উমাও সারাদিন মেনকার সান্নিধ্যে না থেকে বরং পাড়াপড়শীদের গৃহে ঘুরে বেড়ানোতে বেশি আনন্দ পেয়েছে। যার দ্বারা তার শিশুমন পরিভূক্তি পেয়েছে।

উমা সারাদিন পরিশ্রম করে বেলাশেষে গৃহে ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছে। মেনকা সেই চাঁদ মুখ দেখে মনে মনে সুখ অনুভব করেছেন। এই চিত্রটিও কবি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন—

“সন্ধ্যাবেলা অবস হল ঘুমের ঘোরে  
মায়ের সুখের পান মুখে রহিল।”<sup>২৮</sup>

জন্মের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত শিশুর সত্তা তার মায়ের সত্তার সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকে; জন্মের পরে সে নিজস্ব এক শারীরিক গঠনশক্তি লাভ করে। আবার ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে একটি শিশু নিজের পায়ের উপর ভর করে হাঁটতে শেখে। তাদের সেই চলার ভঙ্গিমা অত্যন্ত মনোহর। ছোট্ট উমার চলার ভঙ্গিটিও এখানে সেই রূপেই উঠে এসেছে।

কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালি মির্জা) উমার সেই আধো আধো পায়ে চলার ভঙ্গিকে সুন্দরভাবে তার একটি পদের মধ্যে বর্ণনা করেছেন—

“চঞ্চল চরণে চলে অচলনন্দিনী  
তরুণ অরুণ যেন চরণ দুখানি  
জননীর হাত-ধরা খাটিচ্ছে সুধা অধরা  
আনন্দে অধীর ধরা ধন্য গনি।”<sup>২৯</sup>

মানুষ সামাজিক জীব, গোষ্ঠীবদ্ধভাবে জীবন যাপন করায় হল তার ধর্ম। আর একটি শিশুও হল একজন মানুষ। তাই স্বাভাবিকভাবে তারাও চায় গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বেড়ে উঠতে আর এই গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সে চায় তার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের, যাদের সঙ্গে সে খেলাধুলা করে নিজের সামাজিক ও মানসিক বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। পদকর্তা কালি মির্জা শিশু মনস্তত্ত্বের এই দিকটির প্রতি নজর রেখেই উমার শৈশবকালীন জীবনের একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন। যেখানে সমস্ত সমবয়সী সখীদের সঙ্গে উমা নিজের শৈশবকালীন খেলা খেলে চলেছে। যা শুধু পদকার নন, পাঠকের মনেও আনন্দরস তৈরী করেছে। কবি তাঁর বাল্যলীলা পর্যায়ের পদে বলেছেন—

“সব সখী সঙ্গে খেলে কালি কালি বলে  
কালকে গিরি বালি কে হয়েছে আপনি।”<sup>৩০</sup>

বলা যেতে পারে, শাক্ত পদাবলীর বাল্যলীলা পর্যায়ের পদগুলিতেও বিভিন্ন পদকার উমার শৈশবে বেড়ে ওঠাকে কেন্দ্র করে শিশু মনস্তত্ত্বের এক নিবিড় ধারণা তৈরি করেছেন। যেখানে ছোট্ট উমার বিভিন্ন দুরন্তপনা ও চঞ্চলতা বারবার পাঠকের মনকে আকর্ষণ করেছে। উমা শুধুমাত্র গিরিরাজ ও মেনকার কন্যা হয়ে থাকেনি, তার আচরণের মধ্যে পাঠক খুঁজে পেয়েছে নিজ সন্তানের প্রতিবিম্ব। বলা যেতে পারে, সমগ্র পদাবলী সাহিত্যে বিশেষত বাৎসল্য পর্যায়ের পদে শিশুমনের এই অভিনব দিকগুলি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উঠানটিকে সমৃদ্ধ করবে।

## Reference:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ, ‘সবুজপাতা ৩’, শিশু কিশোর আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ তৃতীয় শিশু কিশোর উৎসব ২০১০, পৃ. ১৭৭ (সম্পাদনা)
২. দাস, রমেশ, ‘শিশু-মন’, ভোলানাথ প্রকাশনী, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৫২, পৃ. ১০
৩. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ, ‘বৈষ্ণব পদাবলী’, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬১, পৃ. ৫১৪
৪. তদেব, পৃ. ৭১৪
৫. তদেব, পৃ. ৭৪১
৬. তদেব, পৃ. ৭৪৩
৭. তদেব, পৃ. ৯৭৩
৮. তদেব, পৃ. ৫১৪
৯. আহমেদ, শাহীন, ‘শিশু বর্ধন, বিকাশ পরিচালনা ও পারিবারিক সম্পর্ক’, আইডিয়াল বুকস ঢাকা, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৮৪, পৃ. ১৬৫
১০. ঘোষ, অসিতবরণ, ‘আপনার শিশু সম্পর্কে আপনার যা জানা উচিত’, কথাপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ২০২২, পৃ. ৫০ (অনুদিত)
১১. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ, ‘বৈষ্ণব পদাবলী’, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬১, পৃ. ৭৪১
১২. তদেব, পৃ. ৯৭৩
১৩. তদেব, পৃ. ৯৭৪

১৪. তদেব, পৃ. ৭৪২
১৫. তদেব, পৃ. ৭৪২
১৬. দাস, রমেশ, 'শিশু-মন', ভোলানাথ প্রকাশনী, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৫২, পৃ. ৬৪
১৭. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ, 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬১, পৃ. ৭৪১
১৮. তদেব, পৃ. ৫১৭
১৯. তদেব, পৃ. ৫১৫
২০. তদেব, পৃ. ৭৪২
২১. তদেব, পৃ. ৭৪২
২২. রায়, অমরেন্দ্রনাথ, 'শাক্ত পদাবলী (চয়ন)', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ ১৯৪২, একাদশ সংস্করণ ১৯৯৭ পৃ. ১
২৩. গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ, 'সবুজপাতা ৩', শিশু কিশোর আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ তৃতীয় শিশু কিশোর উৎসব ২০১০, পৃ. ১৭৭ (সম্পাদনা)
২৪. রায়, অমরেন্দ্রনাথ, 'শাক্ত পদাবলী (চয়ন)', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ ১৯৪২, একাদশ সংস্করণ ১৯৯৭ পৃ. ১
২৫. তদেব, পৃ. ২
২৬. তদেব, পৃ. ১
২৭. তদেব, পৃ. ২
২৮. তদেব, পৃ. ২
২৯. তদেব, পৃ. ২
৩০. তদেব, পৃ. ২